

## এক সঙ্গে নির্বাচন এবং সরকার গঠন - আবদুল মতিন খান

Courtesy: AjkerKagoj, Dhaka, November 10, 2005

[http://www.ajkerkagoj.com/2005/Nov10/khola\\_hawa.html](http://www.ajkerkagoj.com/2005/Nov10/khola_hawa.html)

সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা করা হয় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব করতে। উদ্যোগটা নিয়েছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ তখন বিরোধী দল। দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নিয়ে বিএনপি তখন ক্ষমতায় থাকায় আওয়ামী লীগের ধারণাটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে বিএনপি। সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করা হয় সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত সর্ব শেষের প্রধান বিচারপতিকে। দেশের সবক'টি শ্রদ্ধের প্রতিষ্ঠান লুস্পেন বিত্তশালীদের ঋণের পড়ে নষ্ট হয়ে গেলেও উচ্চ আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা দেশবাসীসহ লুস্পেন বিত্তশালীদেরও ছিল। স্বার্থ নিয়ে হানাহানি বাংলাদেশে এখন তুঙ্গে। স্বার্থ নিয়ে সংঘাত বাঁধলেই উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। এ কারণেই, বিরোধী দল আওয়ামী লীগের উদ্ভাবনা হলেও, বিএনপিসহ সকল দল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানরূপে সুপ্রিম কোর্টের অব্যবহিত আগের প্রধান বিচারপতিকে মেনে নেয়। নেওয়ার কারণ কিছু নয়, তার মর্যাদাপূর্ণ উচ্চ অবস্থান।

সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত অব্যবহিত আগের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে তিনটি নির্বাচন হয়েছে। যে দল নির্বাচনে হেরে গেছে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি বলে অভিযোগ তুলে, সংসদে যাওয়া থেকে তারা বিরত থেকেছে। তবে গত নির্বাচনের ফলাফল দেখে আওয়ামী লীগের আগামীর নির্বাচনে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিয়ে নির্বাচন করানোর আর সম্মতি নেই। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা পরিত্যাগ না করলেও এর গঠনের পরিবর্তন দাবি করে সংশোধনী পেশ করেছে। তাদের প্রস্তাবিত গঠনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য কেবল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নন, উচ্চ মর্যাদার সর্বদলমান্য যেকোনও ব্যক্তিই ওই পদ পেতে পারবেন। আওয়ামী লীগ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের জন্যও প্রস্তাব পেশ করেছে। তারা এও বলেছে যে, তাদের প্রস্তাবানুগ নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার হয়েছে দেখতে না পেলে তারা নির্বাচন হতে দেবে না।

এ সব দেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান আগামীর নির্বাচনের জন্য যিনি হতে পারতেন তিনি ওই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে তার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এখন দেখা যাক সংবিধান সংশোধন করে, না সংবিধানের প্রধান বিচারপতির পর যিনি ওই পদে বসতে পারেন তিনি, সর্বদলমান্য হয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সম্মত হন কি না। অবস্থা যে রকম তাতে আত্মমর্যাদাবোধ আছে এমন ব্যক্তির ওই পদ গ্রহণে রাজি হওয়া কঠিন।

বহুকাল ধরে সর্বজনশ্রদ্ধের পদের প্রতি হঠাৎ করে কেন আস্থার অভাব দেখা দিল এটা একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। দেখা দেওয়ার কারণ হলো বাংলাদেশের বিত্তবানদের বুর্জোয়া হয়ে উঠতে না পারা। তারা সত্যিকার বুর্জোয়া হলে প্রতিটি নির্বাচনের ফলাফলই মেনে নিতেন। পদে উচ্চই হোক আর নিম্নই হোক দলীয় রাজনীতি যেখানে আছে পদাধিকারীরা একটি দলের হবে সমর্থক। তারা নিরপেক্ষ হলে ভালো। না হলে কিছু করার নেই। এটাই বুর্জোয়া দলীয় রাজনীতির নিয়ম। জর্জ বুশের আগের মেয়াদের নির্বাচনের কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ওই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। নির্বাচনের ফলাফল যথাযথ হয়েছে কিনা তার সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রিম কোর্টের গরিষ্ঠ সংখ্যক বিচারক ছিলেন বুশের দল রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক। তাদের ভোটের নির্বাচনের ফলাফল বুশের পক্ষে যায়। এ নিয়ে কথা উঠেছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায় বলে কথা আর এগোয় না। পরাজিত প্রার্থী আল গোর তার পরাজয় মেনে নিয়ে যে ভাষণ দেন তাতে সুকৌশলে তিনি কারচুপি এবং সুপ্রিম কোর্টের বুশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানোর জন্যও ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করলেও বুশকে তার প্রেসিডেন্ট হিসেবে কবুল করে নেন। তিনি বলেন, এই মেনে নেওয়াই হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য। তিনিও ওই

ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। কারচুপি এবং পক্ষপাতদুষ্টতার দ্বারা পরাজিত আল গোরকে রাজনীতি নিয়ে আর কথাবার্তা বলতে দেখা যায়নি।

দলীয় রাজনীতির জগৎ হয়েছে ইউরোপী সমাজ পুঁজিবাদী হয়ে গেলে। সামন্ত যুগে রাজা কর তুলতেন ও তা খচর করতেন তার খেয়ালখুশি মতো। অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ দেখা দিলে পুঁজিপতিরা রাজতন্ত্রের এ নিয়ম মানতে অস্বীকার করল। তারা বলল যারা কর দেবে তারা কতটা কর দেবে এবং ওই কর কীভাবে খরচ হবে সে ব্যাপারে করদাতাদের মতামত নিতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিনিধি সভা গঠন করতে হবে। জনপ্রতিনিধিরাই করের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, আর কেউ নয়। প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর দেওয়া নেই। ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত এ নিয়েই হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার পেছনেও রয়েছে কর ও শুল্ক নিয়ে ব্রিটিশরাজ্যের সঙ্গে উপনিবেশের পুঁজিপতিদের বিরোধ। পুঁজিপতিরাই সংসদীয় ভোটতন্ত্রের জগদাতা।

প্রতিনিধি সভা তো হলো। কিন্তু কর কে কতটা দেবে এই নিয়ে সাংসদদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল বাকবিতণ্ডা। এক দল বলল, যেমন যুক্তরাষ্ট্রে, পুঁজিপতিরা কেউ কর দেবে না, যদি দেয়ও দেবে খুব কম যেহেতু তারা শিল্প কারখানা করে, অবকাঠামো তৈরি করে, সড়ক এবং রেলপথ তৈরি করে যা দেশের ও জনগণের সার্বিক উন্নয়নে এবং জনগণকে কাজ দেওয়ায় বিরাট অবদান রাখে। কর দেবে কেবল উন্নয়নের সুবিধাভোগীরা অর্থাৎ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। অন্য দল বলল, এটা অন্যায়। পুঁজিপতিরা বিপুল বিস্তারিত মালিক। তারা টাকা করে জনগণের কাছে মুনাফায়, কখনও কখনও অতিরিক্ত মুনাফায়, পণ্য ও সেবা বিক্রি করে। অতএব, বেশিরভাগ কর তাদেরই দেওয়া উচিত। প্রথম দিকের সংসদে কোনও দল থাকলেও কিংবা কেবল এক দল থাকলেও অচিরে জনপ্রতিনিধিরা করের প্রশ্ন বিভক্ত হয়ে পড়ল। যুক্তরাষ্ট্রে, উদাহরণস্বরূপ, পুঁজিপতিদের কর না দেওয়া অথবা যৎ সামান্য দেওয়ার পক্ষে যারা রইল তারা হলো রিপাবলিকান এবং জনগণের সঙ্গে পুঁজিপতিদেরও আনুপাতিক হারে কর দেওয়া উচিত বলে যারা অভিমত ব্যক্ত করলো তারা পরিচিত হলো ডেমোক্র্যাট রুপে। বলা দরকার যে, এ দুই দলই পুঁজিপতিদের; তাদের স্বার্থই এ দুই দল দেখে। পুঁজিপতিরা এই দুই দলে ভাগ হয়ে থেকে তাদের শাসন বা ডিক্টেটরশীপ আজ পর্যন্ত চালু রেখেছে।

পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সামন্ত যুগে মর্যাদা পেতে যে সকল পদ ও প্রতিষ্ঠান যে সব বাজারের অধীন হওয়ার পর তাদের মর্যাদা হারালো অথবা তাদের আগের সে মর্যাদা আর থাকলো না। মার্কস দেখিয়েছেন পুঁজিবাদ আবহমানকাল ধরে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত সকল পদ ও প্রতিষ্ঠানকে কী করে অতি সাধারণের স্তরে আনে নামিয়ে। হিজ হাইনেস হয়ে গেলেন মিস্টার প্রেসিডেন্ট এবং হিজ লর্ডশীপ হয়ে পড়লেন মিস্টার জাস্টিস। আনুষ্ঠানিক রাজতন্ত্র থাকার কারণে ব্রিটেনে সামন্তযুগীয় সম্বোধন আজও টিকে রয়েছে এবং তারই অনুকরণে আমাদের দেশেও। উচ্চ পদের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব বিশালীদের এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর। এ দেশে বিত্ত যারা গড়েছে তারা কেউ মর্যাদাবান ছিল না। মর্যাদা পেয়ে এসেছে যে সব উচ্চ পদ এদের কাছে সে সব পদ সামান্যই মর্যাদা ধরে। অমর্যাদাবান ব্যক্তিরা তাদের স্বার্থে ওই সব পদে তাদের (কখনও অযোগ্য) পছন্দের লোকদের নিয়োগ দেওয়ায় পদগুলোতে আসীনগণ বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন। এ দেশে রয়েছে বিকৃত পুঁজিবাদ। ফলে, নিজ শ্রেণীর বিরোধীদের কাজ ও সিদ্ধান্ত হুঁষ্ট মনে সহ্য করার ঐতিহ্য এ দেশে নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার এটাই কারণ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার.প্রধান কে হবেন সেটা এখন পর্যন্ত অনুমানের বিষয় হয়ে থাকলেও একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নজরদারিতেই যে পরের নির্বাচনটি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পৃথিবীর কোথাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে এবং বিপুল সংখ্যায় নানা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করে নির্বাচন করা হয় না। কেবল বাংলাদেশে এটা হয় এ কারণে যে বাংলাদেশ হলো বিশ্বে দুর্নীতিতে এক নম্বর। নির্বাচনেও ব্যাপক দুর্নীতি হয় বা করা হয় জেনেই বিত্তশালীদের দলগুলো লাল কার্ড দেখাতে পারেন এমন একটি সরকারকে রেফারির দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। তার দায়িত্ব পালন কতোটা নিরপেক্ষ হবে তাই নিয়ে এখন প্রশ্ন। রেফারি দক্ষ এবং নিরপেক্ষ না হলে খেলা মাটি হতে বাধ্য।

যুক্তরাষ্ট্রে যেমন রিপাবলিকান ও ডেমোক্রটিক এবং ব্রিটেনে লেবার ও কনজারভেটিব নামীয় বুর্জোয়াদের দু'টি করে দল রাজনীতির মাঠে আছে, বাংলাদেশের সুশীল সমাজের অনেকের ধারণা, এ দেশেও অনুরূপভাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দু'টি দল সংসদীয় রাজনীতি করতে পারে। এ ধারণা টুয়েজ ডে ক্লাবের সদস্যদের ও ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ ডেস্কের

কর্মকর্তাদেরও অনেকের। ইউরোপ আমেরিকার সরকারগুলো চায় বাংলাদেশে দ্বি.দলীয় সংসদীয় রাজনীতি শিকড় গাঢ়ক। কিন্তু তারা একই সঙ্গে আরও যেটা চায় তা হলো বাংলাদেশে কোনও অবস্থাতেই যেন প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারার বিকাশ ঘটতে না পারে। বাংলাদেশ হলো তাদের একটি চমৎকার শোষণ ক্ষেত্র। সুদসহ বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতির ঋণ শোধ করতে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় বাণিজ্যের দায় পরিশোধ করতে, বাংলাদেশ, তার নানা প্রাকৃতিক ও যুক্তরাষ্ট্র-সৃষ্ট আর্থিক বিপর্যয়ের একাধিকবার মুখোমুখি হয়েছে, কখনও ব্যর্থ হয়নি। তাছাড়া, বাংলাদেশ থেকে তারা জলের দরে গার্মেন্টস, সিরামিক, চামড়া, মাছ ও শাকসব্জি এবং এখন ওষুধ আমদানি করে। এটা করতে পারে বাংলাদেশের শ্রমিককে দিনে এক ডলারেরও কম মজুরি নিতে বাধ্য করে। বাংলাদেশে তারা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের নামে অবিশ্বাস্য অসম শর্তে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও কয়লা খাত থেকে বিপুল অর্থ লুটে নিয়ে যাচ্ছে। এটা সম্ভব হচ্ছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামাতের মতো দলগুলো রাজনীতির মাঠে থাকায়। পশ্চিমের শক্তিগুলো এবং চীন, ভারত ও জাপানও চায় বাংলাদেশে এ দলগুলোই ঘুরেফিরে শাসন ক্ষমতায় আসুক। এ দলগুলো যাতে টিকে থাকতে পারে তার জন্য এ দেশে মধ্যযুগাঙ্কতার বিস্তার ঘটাতে জামাত ও অন্যান্য ধর্মাশ্রয়ী দলগুলোকে মাঠে অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আর এ সবই টুয়েজ ডে ক্লাবের উৎসাহে ও তাদের নজরদারিতে। টুয়েজ ডে ক্লাব চায় এ দলগুলো নিয়ম মেনে চলুক। এ উদ্দেশ্যেই তারা সেমিনার করতে চেয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না।

আওয়ামী লীগ বরাবর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সমর্পিত একটি দল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে তার বিরোধ দেখা দেওয়ায় সাময়িকভাবে এ দলটি বেকায়দায় পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে এ দলটিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে তার জায়গায় জামাতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেহেতু জামাত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছায় সাড়া নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় ছিল জামাতকে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া। জামাতপন্থীদের খুঁজে বের করে তারা সামরিক সরকারের শাসক নিয়োগ করে। সামরিক শাসন বাংলাদেশের মানুষ সহ্য করে না জেনে যুক্তরাষ্ট্র অচিরে রাজনৈতিক কার্যকলাপ গুরুত্ব উদ্যোগ নেয়। আওয়ামী লীগের ওপর তখনও তাদের সন্দেহ ছিল। আওয়ামী লীগ বাকশাল থেকে তখনও আওয়ামী লীগ হয়নি। আওয়ামী লীগের তখনও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত উৎখাত করে মুক্ত বাজার অর্থনীতি গ্রহণের ঘোষণা ছিল বাকি। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যযুগাঙ্ক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের দরকার দেখা দিল। এ লক্ষ্যেই বিএনপির

সৃষ্টি। সৃষ্টির সময় সংগঠকদের বলা হলো তাদের সৃষ্ট দলটির আদর্শ হবে হুবহু জামাতের অনুরূপ। জামাতকে সঙ্গে রাখতে পারলে ভালো। সম্ভব না হলে জামাতের নির্দেশ মতো বিএনপিকে সর্বদা চলতে হবে। সেভাবেই তারা জগা থেকে চলছে।

আওয়ামী লীগ ব্যাপারটা জানে। এ জন্যই নিকট অতীতে জামাতের সঙ্গে তারা সমঝোতার রাজনীতি করেছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর পরও তারা জামাতকে ঘাটায়নি। জামাতকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফ্যাঙ্কর হয়ে ওঠার ব্যাপারে তারা বাধার সৃষ্টি করেনি। জামাত যদি বিএনপিকে ছেড়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে এসে ভেড়ে, নির্বাচনে তার কৌশল হিসেবে সেটাকে দেখিয়ে, তারা জামাতকে সানন্দ চিন্তে গ্রহণ করবে। চার দলীয় জোটের আগামীর নির্বাচনে ভরাডুবি দেখতে পেয়ে জামাতও, কৌশলগত কারণ দেখিয়ে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে এসে যোগ দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মনে এ রকম একটি ভাবনাই আছে। এর বাস্তবায়ন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে করলে তার সুবিধা হবে সে ভাবেই করতে। এটা আওয়ামী লীগ কিংবা জামাত কারও ওপর নির্ভর করে না।

এর মধ্যে খবর বেরিয়েছে এক সঙ্গে আন্দোলন, এক সঙ্গে নির্বাচন ও এক সঙ্গে সরকার গঠনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট ঘরে বাইরে ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। খবরে এ কথাও বলা হয়েছে, এই জোটের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে বিকল্প ধারা বাংলাদেশ এবং ইসলামিক ফ্রন্টসহ আরও কতিপয় দল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পর বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে। খবরে আরও উল্লেখ হয়েছে, সিপিবিও আসন বন্টন নিয়ে ইতিবাচক সাড়া পেলে, নাটকীয়ভাবে ১৪ দলীয় জোটে ফিরে আসতে পারে, নাটকীয়ভাবে একদা তারা যেভাবে চলে গিয়েছিল।

দল গঠন ও জোট গঠন নিয়ে বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে ভাঙা গড়ার খেলা চলছে। যুক্তরাষ্ট্র ও টুয়েজ ডে গ্রুপের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে পাশ্চাত্য অনুগত একটি দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যেই তারা কাজ করে যাচ্ছে। তাদের আরও লক্ষ্য হলো পাশ্চাত্যের স্বার্থ বিঘ্নিত করতে পারে এমন কোনও রাজনৈতিক শক্তি যেন এ দেশে জায়গা করে না নিতে পারে। নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশে কোন ধরনের জোট গঠন হবে এবং কাদের দিয়ে হবে সেই জোট তা বাংলাদেশের দলগুলোর ওপর সর্বাংশে নির্ভর করে না।

ইসলামী মৌলবাদ পাশ্চাত্য কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কোনও হুমকি নয়। ইসলামী মৌলবাদ হুমকি হয়ে থাকলে তা মুসলমান দেশগুলোরই পক্ষে। মুসলিম দেশগুলোকে মধ্যযুগে রেখে অথবা ঠেলে দিয়ে তাদের সম্পদ নির্বিরোধে শোষণ করাই হলো যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইসলামী মৌলবাদের সৃষ্টি ও তার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা। মৌলবাদীদের দেশপ্রেমিক একাংশ বিষয়টি ধরতে পেরে এর সৃষ্টা যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রতি ক্ষেপে গিয়েছে। কিন্তু তারা ১১/৯ (যুক্তরাষ্ট্রীয়রা বলে ৯/১১)র ঘটনার জন্য দায়ি নয়। আফগানিস্তান ও ইরাক দখলের জন্য তালেবান ও আল কায়দার গল্প তৈরি করে রটানো হয়। এ গল্প যে পুরোপুরি মিথ্যা তা এখন তাদের গোয়েন্দা সংস্থার বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা স্বীকৃত। আল কায়দা বলে কোনও মৌলবাদী সশস্ত্র সংস্থা আছে কি না সেটাই এখন প্রশ্নের মুখে। কিন্তু আল কায়দা ও তার পরিচালক ওসামা বিন লাদেনকে সচল রাখা হয়েছে আফগানিস্তান ও ইরাকের ওপর পরিচালিত সীমাহীন বর্বরতা জায়েজ বা যুক্তিসিদ্ধ করতে। এ পরিস্থিতির পৃষ্ঠপটে বাংলাদেশের নির্বাচনী জোট গঠন বিশেষ তাৎপর্য ধারণ করে। নির্বাচনে মৌলবাদীদের কতোটা ভূমিকা রাখতে দেওয়া হবে সেটা সেকুলারিস্টদের অবশ্য লক্ষ রাখতে হবে।

বিরতিহীন মূল্যবুদ্ধি দ্বারা সাধারণ মানুষের জীবনমান ক্রমাগত নামিয়ে দেওয়া, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নিয়ে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা এগুলোর নিরসনই হলো এখনকার জ্বলন্ত ইস্যু। একটি মৌলবাদী জোট বিদেশি শক্তির মদদে দেশটাকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় নিয়ে গেছে। দেশ এবং মানুষকে রক্ষা করাই হওয়া চাই এখনকার রাজনীতির লক্ষ্য। বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের প্রচেষ্টা এ মুহূর্তে হওয়া দরকার নির্বাচনে জেতার জন্য কেবল জোট গঠন নয়, তার অতিরিক্ত কিছু। দ্বি.দলীয় সংসদীয় রাজনীতি চালু করার যে চেষ্টা চলছে তাতে আপাতত আপত্তির কিছু থাকতো না যদি বিভাগশালীদের দলগুলো তাদের সম্মুখে রাখতে পারতো ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থ।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতে জাতীয় সরকার না কি গঠন করতে চায়। বিএনপির মহাসচিব বলেছেন, বিএনপিকে বাদ দিয়ে জাতীয় সরকার হয় কী করে? কথাটা যথার্থ। দেশের যে অবস্থা তাতে সকল দলকে নিয়ে আপৎকাল পাড়ি দিতে বিএনপিকে নিয়েই জাতীয় সরকার করতে হবে। কিন্তু তার আগে বিএনপিকে অবশ্যই জামাত এবং মৌলবাদ ছাড়তে হবে। সকল দলকে ছাড়তে হবে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস সেটাই হতে পারে এক সঙ্গে নির্বাচন ও সরকার গঠন প্রচেষ্টার সার্থকতা।

আবদুল মতিন খান: রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ বিকাশ বিষয়ে সন্ধিৎসু।



মেরীঅ্যান পিটারস ও নিজামীর "কাহুত"  
জামাতের মডারেট মুসলিম পলিটিক্যাল দল সনদ  
লাভের গোপন কথা ..... 1) Photo credit Inqilab  
Feb. 2003